আজকের কাগজ

তারিখ ... 23 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

# মেধার চর্চা ঃ বাংলা ও ইংরেজির প্রাসঙ্গিকতা

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

উচ্চতর পর্যায়ে কোনোকিছু চিন্তা করা ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য বা ক্ষমতাকে অভিধানে মেধা বা ইনটেলেক্ট বলা হয়েছে। মেধা মূলত মানুষের এক ধরনের অন্তর্গত শক্তি যার সাহায্যে ব্যক্তি তার প্রবণতা-অনুসারে কোনোকিছু জানার আকাঙক্ষা করে এবং সেই লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের অধিকারী হয়। ব্যক্তির আহরিত জ্ঞান, উপলব্ধ সত্য, তার পরীক্ষা পরিশীলিত তত্ত্ব তখন তার প্রাতিস্বিক বলয় অতিক্রম করে সার্বমানবিক হয়ে ওঠে।

মেধা মানুষের চিরকালের পরিচয়। অন্য কথায়, এই বিশেষ বৃত্তিই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। তৎসত্ত্বেও আমরা বলিঃ অমুকের মেধা আছে, অমুক মানুষ হিসেবে একেবারে মেধাহীন। এ জাতীয় উক্তিতে আপাতভাবে মানুষের মৌলিকত্বকেই অস্বীকার করা হয়। কিন্তু উক্তিটি যেহেতু প্রচলিত আছে এবং অতি সাম্প্রতিককালেও তা আমরা উচ্চারণ করছি এবং ভবিষ্যতেও এ জাতীয় প্রবচন মানব-চরিত্র মূল্যায়নে সমান প্রযুক্ত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি সেহেতু তা ভিন্ন বিবেচনায় আলোচনাযোগ্য। শ্রমজীবী, পেশীবহুল মানুষ এবং ভাবুক, বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীগত পার্থক্য নির্দেশ করলেই তাই মেধাবী ও মেধাহীনের মধ্যে বিরাজিত পার্থক্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হবে।

শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন তার কর্মজগতের মধ্যেই আবর্তিত হয়। পেশাগত নৈপুণ্য অর্জনের মধ্যেই তার সার্থকতা আসে। কিন্তু মেধাবী ব্যক্তি, একজন ভাবুক, দার্শনিক কিংবা শিক্ষকের কর্মপরিচয় ভিন্ন। তাঁকে কেবলই ভূমি-আশ্রয়ী কিংবা নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সংলগ্ন থাকলে চলে না, তাঁর দায়িত্ববোধই তাঁকে কিছুটা ঊর্ধ্বচারী, বহির্মুখি হতে শেখায়। বৈশ্বিক মানব-চিন্তার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হতে হয় আবার স্বদেশের প্রতি আন্তরিক আবেগকেও তিনি তাঁর শোণিত ধারায় বহন করেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে তাঁর মধ্যে মানবহিতৈষী চেতনারও জন্ম হয়। তিনি অধীত বিদ্যার উদ্‌গিরণের মধ্যেই মুক্তি খোঁজেন না। অভিজ্ঞতাকে তিনি যেমন তাঁর সত্য-ঘোষণার অনুকূলে ব্যবহার করেন তেমনি নিজের চিন্তন ক্রিয়ার দ্বারা তিনি মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। সামষ্টিক মুক্তি, সমাজ অগ্রগতিতেই তাঁর লক্ষ্য হয়। মেধাবী ব্যক্তিকে তাই সাধারণের পঙক্তিতে বদ্ধ করা চলে না। সাধারণের মধ্যে বাস করেও তিনি হন অসাধারণ, ট্রাজেডির নায়কের মতোই তিনি অ্যাবভ্‌ দ্য কমন লেভেল। রাজা ও প্রজা, চাষার ছেলে ও রাজপুত্র, সম্পন্ন কৃষক ও জমিদারের নায়েব, একজন সাধারণ গৃহী মানুষ ও একজন ধীমান শিক্ষক, একজন হাতুড়ে ডাক্তার ও একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মধ্যেকার বৈলক্ষণতাই একান্তভাবে মেধাগত।

পৌরাণিক কিংবা বৈদিক যুগেও মেধার চর্চা হয়েছে। সেই ঐতিহ্য যুগযুগান্তর পেরিয়ে বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে বর্তমানে এসে পৌছানোর কথা। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পাইনি। আমাদের সমাজের ও রাজনীতির অতীত ইতিহাসে বিদেশী শক্তির প্রাধান্যই থেকেছে ব্যাপকভাবে, আর সেই আগ্রাসনের সূচনা মোঘলদের আগমনের সঙ্গে। মোঘল আমলে ফারসিই ছিল রাজভাষা। তখন কথিত অভিজাত সম্প্রদায় হয়েছেন আগ্রহী। রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করে উচ্চতর রাজকর্মচারী হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় মেধারই তাঁরা চর্চা করেছেন। অতঃপর এসেছে ইংরেজ শাসন, ফরাসির স্থান দখল করেছে ইংরেজি।

ইংরেজ শাসনের অর্থ ইংরেজদের শাসন, প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। পূর্বের মোঘলীয় রীতিতে তা সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সে অনুযায়ী সংস্কারসাধনেও কালক্ষেপ করেনি। ফরাসির পরিবর্তে তারা ইংরেজিকেই সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দই এ ব্যবস্থা হয়েছে প্রবর্তিত। কিন্তু ইংরেজির মাধ্যমে মেধার শুরু আরোও আগে। আর এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু কলেজ'। এ কলেজের ছাত্ররাই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় প্রথম আগ্রহী হয়েছেন। বাঙালিদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধার বিকাশের সূচনা এক অর্থে তাঁদের আবির্ভাবের সঙ্গে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর আলোকে যে নবজাগরণের সূচনা হয় সেই চৈতন্য স্রোতের প্রবক্তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। ইংরেজির চর্চা করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে আরোও এক ধরনের সচেতনতার জন্ম হয়। তাঁরা ভার্নাকুলার এডুকেশনের গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করেন। ইয়ং বেঙ্গলদের পুরোহিত-প্রতিভা ডিরোজিওর শিষ্য উদয়চন্দ্র আঢ্য বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ও তা প্রচলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরই সতীর্থ প্রতিভা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিকলাল মল্লিক যুগ্মভাবে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা। এ পত্রিকায় সুস্পষ্টভাবেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও আদালতের ভাষা হিসেবে গ্রহণের পক্ষে মত দেয়া হয়। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

"আদালত জজ সাহেবদের আরামের জায়গা নয়, কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার জন্য। আদালত ন্যায় বিচারের মন্দির বলিয়া ধরা হয় কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার কলেজ বলিয়া নয়। সুতরাং বাংলাদেশের জনসাধারণ এখানে নিজেদের ভাষা ব্যবহার করিবে।"

এ পথ ধরেই এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিষ্ঠা করেছেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০), এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত।

হিন্দু সমাজ যে কাল পরিসরে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছেন মুসলিম সমাজ সেই সময়কালে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে ও নিজেদের মেধার বিকাশে প্রত্যাশিতভাবে সফল হয়নি। এর একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন।

ইংরেজ-শাসনকে মুসলমানেরা প্রথম থেকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ইংরেজের বিরতির সুযোগ-সুবিধে থেকেও তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। হিন্দু কলেজের মাধ্যমে হিন্দু ছাত্ররা তাই যখন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত থেকেছে মুসলমান সম্প্রদায় তখন আরবি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের ধর্মশাস্ত্র, আইন ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্যে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্‌টিংসের কাছে আবেদন করেছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, হিন্দু কলেজে মুসলিম ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল না। হেস্টিংস মুসলমানদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 'ক্যালকাটা ম্যাদাসা' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮২৮ পর্যন্ত মাদ্রাসাই ছিল বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। সমকালের হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের বিষম ব্যবস্থার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সামাজিক ও বৌদ্ধিক পার্থক্য প্রবল রূপ ধারণ করে। মুসলিম নেতা, মুক্ত-চিন্তায় বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গও তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ, বিচারপতি আমির আলী

আজকের কাগজ

তারিখ ... 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রমুখ মুসলমানদের আবশ্যিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার পরামর্শ দেন। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালকাটা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগও খোলা হয় এবং এই মাদ্রাসার অনুসরণে এবং হাজী মোহাম্মদ মুহসীনের অর্থানুকূল্যে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেও খোলা হয় অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ।

১৮৩৬-উত্তরকালে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি চর্চার নবতর উৎসাহ লক্ষ করা যায়। কিন্তু সে আগ্রহ যতনা ছিল আন্তরিক তার চেয়েই বেশি ছিল বাস্তববুদ্ধি পরিচালিত। কেননা ইতিমধ্যে ইংরেজের প্রশাসনিক নীতিতেও পরিবর্তন এসেছে এবং ইংরেজিকে পূর্বের তুলনায় আরো দৃঢ়ভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। ১৮৫৫-তে ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের জন্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদ সংরক্ষিত হয়েছে। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘোষিত হয়েছে যে, মুনসেফ, উকিল এমনকি দারোগার পদ পর্যন্ত তাঁরাই লাভ করবেন যাঁরা কমপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অর্থাৎ, ইংরেজি জানেন। বস্তুত, বৈষয়িক লাভ, সরকারি চাকরির মাধ্যমে জীবন-জীবীকাকে নির্বিঘ্ন করার তাগিদ বোধ করার সঙ্গেই মুসলমানেরা ইংরেজি শিক্ষায় হয়েছে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুসলিম প্রতিষ্ঠান বিশেষত, 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ম্যাহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, আঞ্জুমান সংঘ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে আমির আলীর প্রচেষ্টায় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয় এবং তিনিই ছিলেন এর সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রাথমিক (প্রাইমারি) শিক্ষা প্রসারের জন্যে সরকারি বৃত্তি চালু হয়। ম্যাহামেডান অ্যাসোসিয়েশন বাংলায় বিএ কলেজ প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন। অর্থাৎ সমকালীন হিন্দুসমাজের বৌদ্ধিক ও মেধাগত বিকাশের আলোকে মুসলিম সমাজকেও উন্নীত হওয়ার আহবান জানানো হয়। অন্যদিকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ম্যাগামেডান লিটারেরি সোসাইটি' বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে ইংরেজি চর্চার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এই সোসাইটির অধিকাংশ সভ্যই ছিলেন মধ্য ও উচ্চবিত্তের মুসলমান। নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়।

আঞ্জুমান আন্দোলনে বিশ্বাসীগণ ধর্মবোধ, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েও ইংরেজদের প্রতি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন। ফলে তাঁদের প্রচেষ্টায় ইংরেজদের প্রসঙ্গে মুসলমানদের অন্তরে লালিত বৈরী ভাব দূর হয়। মুসলমানেরা অতঃপর ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ১৯২১ সালে। একেবারে শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ রয়েছে। তবে বর্তমানের মতো বাংলা বিভাগ নাম এর ছিল না। আদিতে এর নাম ছিল 'সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ'।

পূর্ববাংলার মুসলিম মেধা বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার সূতিকাগার এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আবার ভাষা আন্দোলনসহ পূর্ববাংলার অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের লক্ষ্যে সংগঠিত সকল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার মতো এখানেও বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং বাংলা, আরবি-ফারসি-উর্দু বাদে সকল বিভাগেই পাঠদান করা হয়েছে ইংরেজিতে এবং সে ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়েই ছাত্রসমাজ জ্ঞানার্জন করে এসেছে। তবে প্রকৃত মেধা বলতে যা বোঝায় তার আত্মপ্রকাশ খুব বেশি লক্ষণীয় নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও জীবনক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্র মোক্ষ খুঁজেছেন।

স্পষ্টতই এখন দু'টি পরস্পর বিরোধী মত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং যত দিন যাচ্ছে দু'পক্ষের ব্যবধান ততো বাড়ছে। ইংরেজিবাদীদের যুক্তি এই যে, বিশ্বে মানববিদ্যার চর্চায় ইংরেজি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ে অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরেজিতে প্রণীত। তাছাড়া ইংরেজ শাসনে দীর্ঘকাল থাকার ও এতোদিন ইংরেজির মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা করার ফলে আমরা ইংরেজির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। ইংরেজি বিসর্জন দিলে সে প্রচেষ্টা তাই হবে আত্মঘাতী।

মাতৃভাষার স্বপক্ষের শক্তি বা বাংলাবাদীদের পক্ষেও যুক্তি আছে। তাঁদের বিবেচনায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌল লক্ষ্য হওয়া উচিত মেধা সৃষ্টি, ইংরেজি ভাষাজ্ঞানী তৈরি নয়। কোনো বিষয় মাতৃভাষায় যত সহজে ও গভীরভাবে অনুধাবন করা যায় বৈদেশি ভাষায় তা সম্ভব নয়। তাই ইংরেজি নির্ভরশীলতার অর্থ হচ্ছে মেধা চর্চার সুযোগকে সংকুচিত করা।

এখন স্থির করা যায় আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। সবাই বলবেন যে, এদেশীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার আশীর্বাদকে জাতির প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। আর তা সম্ভব হলে জাতীয় মেধাও সামগ্রিকভাবে বিকশিত হবে। সে ক্ষেত্রে ইংরেজি অবশ্যই অন্তরায়। কেননা সবার পক্ষে বিদেশি ভাষায় সহজ অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্ত মানলে আবার সমস্যাকেও আলিঙ্গন করতে হয়। তখন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সরবরাহের প্রসঙ্গে আসে। কিন্তু সে সমস্যার সমাধানও দুরূহ নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যুৎপন্ন শিক্ষক মাতৃভাষার মাধ্যমেই দেশের সকল মানুষের কাছে বিশ্বজ্ঞান পৌছে দিতে পারেন। অতীতে সে দায়িত্ব আমাদের শিক্ষক সমাজ, বিজ্ঞানীগণ ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা পালনও করছেন। বস্তুত, শিক্ষকেরাই পারেন মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় মেধা সৃষ্টি করতে।

তবে কি ইংরেজি আমরা শিখব না? আমাদের মেধা চর্চায় ইংরেজি কি নির্বাসিত হবে? এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনও আসেনি। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষত, উচ্চতর পর্যায়ের মেধা চর্চায় ইংরেজির অপরিহার্যতাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে; সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে,এ প্রচেষ্টা যেন ব্যাপক প্রাধান্য না পায়। কেনো না তাতে শিক্ষার্থীদের জীবনে এক দারুণ দুঃস্বপ্নই বয়ে আনা হবে। আমি একথাই বলতে চাচ্ছি যে, মেধাসৃষ্টি ও তার বিকাশই আমাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত। বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত না হলে তা সম্ভব নয়। আর এ জন্যে কিছু ব্যক্তির বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের অবশ্যই সব্যসাচী প্রতিভা থাকতে হবে- ইংরেজি ও বাংলায় তাঁদেরকে হতে হবে সমান ব্যুৎপন্ন। কেননা তাঁরাই মেধার শুশ্রুষাকারী প্রতিভা এবং জ্ঞানের যে আগ্রহ ও আকাঙক্ষা তাঁরা সবার মধ্যে জাগ্রত করবেন তা থেকেই সৃষ্টি হবে জাতীয় মেধার, সাধিত হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় প্রত্যাশিত উৎকর্ষ ও উর্বরতা।

ডক্টর জীনাত ইমতিয়াজ আলী ঃ লেখক, গবেষক, সরকারি কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক। গ্রন্থ ঃ 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌' ঃ জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্ম (১৯৯২)